IOM

স্বলাত সহিহকরণ কোর্স

ইস্তিয়াজা

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

বাসমালাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمٰنِ

অযুর
ফরজ
৪টি

অযুর
ভঙ্গের
কারণ
৭টি

অজুর

ফরজ ৪ টি

১। সমস্ত মুখ ভালভাবে ধৌত করা।

২। দুই হাতের কনুইসহ ভালভাবে ধৌত করা।

৩। মাথা চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা।

৪। দুই পায়ের টাকনুসহ ধৌত করা।
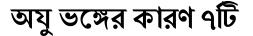
- পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।
- রক্ত, পূঁজ, বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
- মুখ ভরে বমি করা।
- থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।
- চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।
- পাগল, মাতাল বা অচেতন হলে।
- নামাজে উচ্চস্বরে হাসি দিলে।

মৌলিকভাবে অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া। যেমন বায়ু, পেশাব-পায়খানা, পোকা ইত্যাদি। [হেদায়া-১/৭]

ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসলে (নামাজ পড়তে পবিত্রতা অর্জন করে নাও) (সুরা মায়িদা-৬)

হজরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শরীর থেকে যা কিছু বের হয়, তার কারণে অজু ভেঙে যায়...। ' (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি, হাদিস নং-৫৬৮)

২. রক্ত, পূঁজ, বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। [হেদায়া-১/১০]

হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর যখন নাক দিয়ে রক্ত ঝড়তো, তখন তিনি ফিরে গিয়ে অজু করে নিতেন। [মুয়াত্তা মালিক-১১০]

৩. মুখ ভরে বমি করা।

হজরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির বমি হয়, অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, বা মজি (সহবারের আগে বের হওয়া সাদা পানি) বের হয়, তাহলে ফিরে গিয়ে অজু করে নিবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১২২১]

৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া|

হাসান বসরি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি তার থুথুতে রক্ত দেখে তাহলে থুথুতে রক্ত প্রবল না হলে তার ওপর অজু করা আবশ্যক হয় না| [মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং-১৩৩০]

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সিজদা অবস্থায় ঘুমালে অজু ভঙ্গ হয় না, তবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে ভেঙ্গে যাবে, কেননা চিৎ বা কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লে শরীর ঢিলে হয়ে যায়। [ফলে বাতকর্ম হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে] (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-২৩১৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-২০২)

৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হলে।

হজরত হাম্মাদ (রহ.) বলেন, যখন পাগল ব্যক্তি সুস্থ্ হয়, তখন নামাজের জন্য তার অজু করতে হবে। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং-৪৯৩]

৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসি দিলে।

হজরত ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে উচ্চস্বরে হাসে, সে ব্যক্তি অজু ও নামাজ পুনরায় আদায় করবে।

হজরত হাসান বিন কুতাইবা (রহ.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি উচ্চস্বরে হাসি দেয়, সে ব্যক্তি অজু ও নামাজ পুনরায় আদায় করবে। [সুনানে দারা কুতনি, হাদিস নং-৬১২]

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۝

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝

مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝

صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝

স্বলাতের
বাইরের ও
ভিতরের
ফরজ
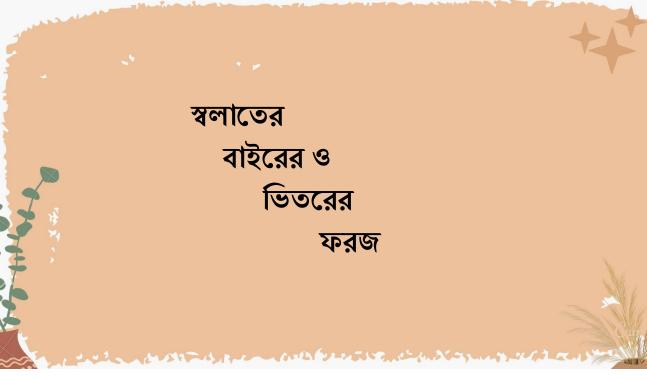
নামাজের বাইরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরজ আছে

নামাজের বাইরের ফরজ ৭টি	নামাজের ভিতরের ফরজ ৬টি

নামাজের বাইরের ফরজ ৭টি

১.শরীর পাক
২.কাপড় পাক
৩.নামাজের যায়গা পাক
৪.সতর ঢাকা
৫.ক্বিবলামূখী হওয়া
৬.ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া
৭.নামাযের নিয়ত করা

নামাজের ভিতরের ফরজ ৬টি

১.তাকবীরে তাহরীমাহ বলা
২.দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া
৩.ক্বিরাআত পড়া
৪.রুকু করা
৫.দুই সিজদা করা
৬.আখিরী বৈঠক

১. তাকবীরে তাহরিমা পড়াঃ তাকবীরে তাহরিমা পড়ে অর্থাৎ আল্লহু আকবার বলে হাত বেঁধে নামাজ শুরু করতে হবে।

২.কিয়াম করাঃ কিয়াম করা অর্থ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা

৩. কিরায়াত করা: নামাজে কিরায়াত করা অর্থাৎ কোরান থেকে তিলাওয়াত করা।

৪. রুকু করা: রুকু করা মানে হলো দাঁড়ানো অবস্থা থেকে অর্ধনমিত হওয়া। যেন হাত হাঁটু পর্যন্ত যায় এবং কোমর, পিঠ ও মাথা সমান্তরালে অবস্থান করে।

৫. সিজদা করা: রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর প্রতি রাকাতে দুটি সিজদা করা ফরজ। সিজদায় নাক এবং কপাল জমিনে ঠেকাতে হবে।

৬. শেষ বৈঠক করা: নামাজের শেষে শেষ বৈঠক করা বা নামাজের শেষ রাকাতে বসা।

সালামের সহিত নামায ভঙ্গ করা সুন্নত। নামায আদায় করতে গিয়ে উপরোক্ত ১৪টি [বাহিরের ৭ টি + ভেতরের ৬টি] ফরযের কোন একেটি ভুলেও ছেড়ে দিলে নামায শুদ্ধ হবে না; নামায পুণরায় পড়তে হবে।

দারসঃ ৪
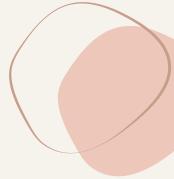
সালাতের ওয়াজিবসমূহ

১। ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাত এবং সকল সুন্নাত, নফল, বিতর ও ঈদের সালাতে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

২. প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সুরা বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ মেলানো। (বুখারি ১/১০৫, হাদিস : ৭৭৬, মুসলিম ১/১৮৫, হাদিস : ৪৫১)

৩। ফরজের প্রথম দুই রাকাতকে কিরাতের জন্য নির্দিষ্ট করা। (বুখারি ১/১০৫, হাদিস : ৭৭৬, মুসলিম ১/১৮৫, হাদিস : ৪৫১)

৪। সুরা ফাতিহা অন্য সুরার আগে পড়া। (বুখারি ১/১০২, ১০৩, হাদিস : ৭৪৩, মুসলিম ১/১৯৪, হাদিস : ৪৯৮, তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৭, হাদিস : ২৪৬ সহিহ)

৫। নামাজের সব রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা (অর্থাৎ রুকু, সিজদা ও রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ দেরি করা)। (বুখারি ১/১০৯, হাদিস : ৭৯৩, মুসলিম ১/১৭০, হাদিস : ৩৯৭)

৬। প্রথম বৈঠক করা (অর্থাৎ তিন অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাতের পর বসা)। (বুখারি ১/১১৪, হাদিস : ৮২৮)

৭| উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া। (বুখারি ১/১১৫, হাদিস : ৮৩০, ৮৩১, মুসলিম ১/১৯৪, ১৭৩, হাদিস : ৪৯৮, ৪০২, ৪০৩, তিরমিজি ১/৮৯, হাদিস : ৩৯১)

৮| প্রতি রাকাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলোর তারতিব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। (বুখারি ২/৯২৪, হাদিস : ৬২৫১, তিরমিজি ১/৬৬, ৬৭, হাদিস : ৩০২, ৩০৩)

৯। ফরজ ও ওয়াজিবগুলো নিজ নিজ স্থানে আদায় করা বৈঠকে আত্তাহিয়াতু শেষ করে তত্ক্ষণাৎ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। (বুখারি ২/৯২৪)

১০। বিতর নামাজে তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কোনো দোয়া পড়া। অবশ্য দোয়া কুনুত পড়লে ওয়াজিবের সঙ্গে সুন্নতও আদায় হয়ে যাবে। (বুখারি ১/১৩৬)

১১। দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

(আবু দাউদ ১/১৬৩, হাদিস : ১১৫৩ হাসান।

১২। দুই ঈদের নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবির বলার পর রুকুতে যাওয়ার সময় ভিন্নভাবে তাকবির বলা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ১/৪৯৫,

(এই তাকবিরটি অন্যান্য নামাজে সুন্নত)

১৩। ইমামের জন্য জোহর, আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নত ও নফল নামাজে কিরাত আস্তে পড়া। আর ফজর, মাগরিব, এশা, জুমা, দুই ঈদ, তারাবি ও রমজান মাসের বিতর নামাজে কিরাত শব্দ করে পড়া। (মুসলিম ১/২৯১, হাদিস : ২৫৯,

১৪। সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা। (বুখারি ১/১১৫, হাদিস : ৮৩৭)

নামাজ ভঙ্গের কারণ

১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া। নামাজের ভেতর কিরাতে যদি এমন পরিবর্তন হয়, যার ফলে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে, আবার তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/৬৩৩-৬৩৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৮০, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৩/৩৪৪)।

২. নামাজের ভেতর কথা বলা। নামাজে এমন কোনো অর্থবোধক শব্দ করা, যা সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (হোক সেটা এক অক্ষর বা দুই অক্ষরে ঘটিত) তাহলে নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক : ২/২)
মুআবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস সুলামি (রা.) নওমুসলিম অবস্থায় নামাজে কথা বললে রাসুল ﷺনামাজের পর তাঁকে বলেন, ‘নামাজের মধ্যে কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা যথোচিত নয়। বরং প্রয়োজনবশত তাসবিহ, তাকবির বা কোরআন পাঠ করতে হবে। (মুসলিম : ৫৩৭)

৩. কোনো লোককে সালাম দেওয়া। নামাজরত অবস্থায় কোনো লোককে সালাম দিলে নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৯২, আল বাহরুর রায়েক ২/১২০)

৪. সালামের উত্তর দেওয়া। নামাজরত অবস্থায় কারো সালামের উত্তর দেওয়া নামাজ ভঙ্গকারী কাজ

৫. উহ্-আহ্ শব্দ করা। নামাজরত অবস্থায় কোনো ব্যথা কিংবা দুঃখের কারণে উহ্-আহ্ শব্দ করলে নামাজ ভেঙে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৪, মারাকিল ফালাহ ১/১২১)

৬. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া। অপ্রয়োজনে কাশি দেওয়ার দ্বারাও নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৬১৮, মারাকিল ফালাহ ১/১২১, আল বাহরুর রায়েক ২/৫)

৭. আমলে কাসির করা। ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে ওই ব্যক্তি নামাজরত নয়। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত ৩/৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে ১/২৪১)

৮. বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা। দুনিয়াবি কোনো বিপদ-আপদ কিংবা দুঃখের কারণে শব্দ করে কাঁদলে নামাজ ভেঙে যায়। (হাশিয়াতু তাহতাবি ১/৩২৫, ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৯, নূরুল ইজাহ, পৃ. ৬৮)

৯. তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা। নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় অনাবৃত থাকে, তাহলে তার নামাজ হবে না। তাই যদি কোনো ব্যক্তির গেঞ্জি, শার্ট বা প্যান্ট নাভির নিচ থেকে রুকু সিজদার সময় সরে গিয়ে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় এভাবে অতিবাহিত হয়, তাহলে তার নামাজ ভেঙে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামী ১/২৭৩, কাফি ১/২৩৮, মাওয়াহিবুল জলীল ১/৩৯৮, মুগনিল মুহতাজ ১/১৮৮, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৭)

নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে নামাজ ভেঙে যাবে। নবী পাক ﷺইরশাদ করেছেন, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ওড়না ছাড়া নামাজ আদায় করলে আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না। (আবু দাউদ : ৬৪১, তিরমিজি : ৩৭৭, ইবনে মাজাহ : ৬৫৫)

১০. মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) লওয়া। যেমন: ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাজের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২২, ফাতাওয়ায়ে আলগীরী ১/৯৮)

১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদে উত্তর দেওয়া। সুসংবাদ অথবা দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া দুনিয়াবি কথার শামিল, তাই এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২)

১২. নাপাক জায়গায় সেজদা করা। নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরি। অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় নামাজি ব্যক্তির শরীর যেসব জায়গা স্পর্শ করে, সে জায়গাগুলো পবিত্র হওয়া, যা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। তাই নাপাক বা অপবিত্র জায়গায় সেজদা করলে নামাজ ভেঙে যাবে। (বাদায়েউস সানায়ে ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৭, তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৯৫)

১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া। কোনো কারণে কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে গেলে নামাজ ভেঙে যায়। তবে যানবাহনে নামাজের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন। (মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮)

১৪. নামাজে কোরআন শরিফ দেখে পড়া। নামাজরত অবস্থায় কোরআন শরিফ দেখে দেখে পড়লে নামাজ ভেঙে যায়। (মারাকিল ফালাহ ১/১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৬)

১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা। নামাজে শব্দ করে অট্টহাসি দিলে ওজুসহ ভেঙে যায়। (কানযুদ্দাকায়েক ১/১৪০)

১৬. নামাজে সাংসারিক কোনো বিষয় প্রার্থনা করা। নামাজরত সাংসারিক/দুনিয়াবি কোনো দোয়া করলে হানাফি মাজহাব মতে নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩)।

১৭. হাঁচির জবাব দেওয়া। নামাজরত অবস্থায় কারো হাঁচির (উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে) উত্তর দেওয়া কথা বলার নামান্তর। এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/১১৭)

১৮. নামাজে খাওয়া ও পান করা। নামাজরত অবস্থায় কিছু খেলে বা পান করলে নামাজ ভেঙে যায়। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার নামাজরত অবস্থায় খেলেও নামাজ ভেঙে যাবে। (মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮)

১৯.ইমামের আগে মুক্তাদী দাঁড়ানো।

সানা

سُبْحَانَكَ اللَّـهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ্ আপনি পাক পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্য; এবং মহিমান্বিত আপনার নাম এবং আপনার সত্তা অতি উচ্চে প্রতির্ষ্ঠিত এবং আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

রুকুর তাসবীহ
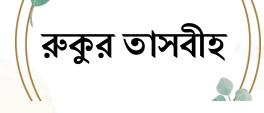
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم

আমার মহান প্রভু পবিত্র

রুকু থেকে উঠার দুয়া

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيْهِ

আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের রব্ব! আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অঢেল, পবিত্র ও বরকত-রয়েছে-এমন প্রশংসা।

ফরজ গোসলের নিয়ম

যেসব কারণে গোসল ফরজ হয়

এক. জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় উত্তেজনার সঙ্গে বীর্যপাত হওয়া। ঘুমন্ত অবস্থায় উত্তেজনা অনুভব না হলেও গোসল ফরজ। কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে মানুষ অনেক সময় টের পায় না। তাই কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে ওঠার পর যদি তার কাপড়ে নাপাকির চিহ্ন দেখে, তাহলে তার স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাতের কথা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় গোসল ফরজ হবে। (হেদায়া ১/৪৫, আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া পৃ. ২৯)

দুই. স্ত্রী সহবাস করা। সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের সর্বনিম্ন সুপারি পরিমাণ অংশ প্রবেশ করালেই উভয়ের ওপর গোসল ফরজ হয়ে যাবে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। (বুখারি, হা. ২৯১, মুসলিম, হা. ৩৪৩)

তিন. নারীদের ঋতুস্রাব বা নেফাস (সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব) বন্ধ হওয়ার পরও গোসল ফরজ। (রদ্দুল মুহতার ১/১৬৫)
এছাড়া অন্য কোন কারণে গোসল ফরজ হয় না। যেমন উত্তেজনা ছাড়া কোন অসুস্থ্যতার কারণে বীর্যপাত হলে গোসল আবশ্যক হবে না।

ফরজ গোসলের ফরজ ৩টি

২. নাকে পানি দেওয়া

৩. সারা শরীরে পানি দেওয়া

১. গড়গড়াসহ কুলি করা: গোসলের প্রথম ফরজ হলো- গড়গড়াসহ কুলি করা। মুখের ভেতর অনেক সময় খাবারের উচ্ছিষ্ট জমে থাকে। গলার ভেতরেও কফ জমে থাকে। তাই গড়গড়াসহ কুলি করলে গলার কফ ও মুখের ভেতর জমে থাকা খাবারের উচ্ছিষ্ট দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ফরজ গোসলের অংশ হিসেবে কুলি করেছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৫৭ ও ২৬৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৫৬৬) রোযা রাখা অবস্থায় যেহেতু গড়গড়া করে কুলি করলেও নাকের গভীরের নরম স্থানে পানি পৌছানোতে ভিতরে পানি প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই গড়গড়া ও নাকের নরম স্থানে পানি পৌছানোতে বেশি চেষ্টা করা প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবে কুলি ও নাকে পানি দিবে। এতে গোসল আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. নাকে পানি দেওয়া: গোসলের আরেকটি ফরজ হলো- নাকের ভেতর পানি দেওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নাকে পানি দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত একাধিক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৬৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৫৬৬)

৩. সারা শরীরে পানি দেওয়া: এমনভাবে গোসল করতে হবে— যাতে শরীরের কোনো অঙ্গ শুকনো না থাকে। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদিস রয়েছে। সেসব হাদিস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গোসল করতেন, তখন তার শরীরের সব অংশ ভেজা থাকতো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২১৭)
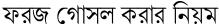
পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়ার নিয়ত করতে হবে। মানে স্ত্রী-সঙ্গম, স্বপ্নদোষ, ঋতুস্রাব ও প্রসব ইত্যাদির কারণে যে নাপাকি এসেছে, সেটা দূর করার নিয়ত করবেন। অর্থাৎ, মনে মনে এই চিন্তা করবেন যে — নাপাকি দূর করার জন্য গোসল করছি।

এরপর লজ্জাস্থানে লেগে থাকা নাপাকি প্রথমে ধুয়ে নেবেন। তারপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবেন। সাবান বা এজাতীয় কিছু দিয়ে ধুতে পারলে ভালো; না হলেও অসুবিধা নেই।

তারপর নামাজের অজুর মতো করে পূর্ণাঙ্গ অজু করবেন। এরপর পানি দিয়ে মাথা ভিজিয়ে নেবেন। তারপর প্রথমে শরীরের ডান অংশে এবং পরে বাম অংশে পানি ঢালবেন। তারপর সারা দেহে পানি ঢালবেন।

রাসূল(সা) যেভাবে গোসল করতেন

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মায়মুনা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তা দিয়ে তিনি জানাবাতের (অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার) গোসল করেন। আল্লাহর নবী (সা.) পাত্র হাতে নিয়ে নিজের ডান হাতের ওপর কাত করে তা দুই বা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর লজ্জাস্থানের ওপর পানি ঢেলে— বাম হাত দিয়ে ধৌত করেন। পরে তিনি মাটির ওপর হাত ঘষে (দুর্গন্ধমুক্ত হওয়ার জন্য) তা পানি দিয়ে ধৌত করেন।

অতঃপর তিনি কুলি করেন এবং নাক পরিষ্কার করেন। অতঃপর মুখমন্ডল ও দুই হাত ধৌত করেন। এরপর তিনি নিজের মাথা ও সর্বাঙ্গে পানি ঢালেন। পরে তিনি সেই স্থান থেকে অল্প দূরে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করেন।

(আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৫)

সূরা ইখলাস

সিজদার তাসবীহ
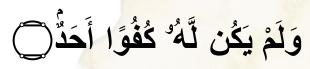
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ

আমার মহান সুউচ্চ প্রভু পবিত্র।

তাশাহহুদ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لآَإِلٰــهَ إِلاَّ اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

দুয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا
وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ
فَاغْفِرْلِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

দুয়া কুনুত
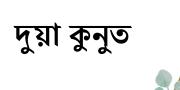
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ
نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ
وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

সাজদায় সাহু

সালাতের মধ্যে ভূল ক্রমে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে, কোনো ওয়াজিব কাজ একাধিকবার করলে অথবা ধারাবাহিকতার পরিপন্থি করলে; সালাত বিশুদ্ধ করার নিমিত্তে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা করাকে ‘সাজদায়ে সাহু’ বলে|

➤সালাতে যেকোনো ভুলের জন্য সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যায়না।

➤কেবল ভুলে ওয়াজিব ছুটে গেলে, কোনো ওয়াজিব একাধিকবার করলে, ফরজ বা ওয়াজিব বিলম্বিত হলে, ধারাবাহিততার পরিপন্থি হলে, সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।

➤ভুলে ফরজ বাদ দিলে সাজদায়ে সাহু যথেষ্ট হবেনা।

সাজদায় সাহু সালাতে সালাম ফেরানোর আগে ও পরে দুই ভাবেই আদায় করা যায়। সর্ব্বোত্তম হচ্ছে তাশাহহুদ পাঠ করত এক দিকে সালাম ফিরিয়ে আদায় করা।

যে ব্যক্তির ওপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, সে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের পর ডান দিকে এক সালাম ফেরাবে এবং তাকবীর বলে নামাযের সাজদাহ এর মত দু'টি সাজদাহ করবে।

তারপর বসে তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ পড়ে সালাত শেষ করবে।

সন্দেহে পতিত হওয়া
ওয়াজিব হ্রাস করা
যেসব ক্ষেত্রে সাজদায়
সাহুআহু ওয়াজিব হয়
ফরজ এবং ওয়াজিবের
ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা
ওয়াজিব বৃদ্ধি করা
ফরজ এবং ওয়াজিবে
বিলম্ব করা

ঈদের
স্বলাত
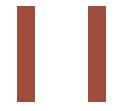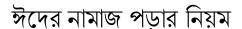
ঈদ মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর দু'টি ঈদ উদযাপন করে। ঈদের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। বছরে দুই বার ঈদের নামাজ পড়ার কারণে অনেকেই নামাজ পড়ার নিয়ম ভুলে যান। তাই ঈদের নামাজের নিয়ম তুলে ধরা হলো-

ঈদের নামাজ ছাদবিহীন খোলা জায়গায় আদায় করা সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলা জায়গায় ঈদের নামাজ আদায় করতেন। যদি খোলা স্থানের ব্যবস্থা না থাকে তবে মসজিদেও ঈদের নামাজ পড়া যাবে।

ঈদের নামাজ খোলা জায়গা, মসজিদ কিংবা বাসা-বাড়ি যেখানেই পড়া হোক না কেন, অবশ্যই তা জামাআতের সঙ্গে পড়তে হবে। জুমআর নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত প্রয়োজন, ঈদের নামাজ আদায় করার জন্যও একই শর্ত প্রযোজ্য। সুতরাং জামাআত ছাড়া ঈদের নামাজ আদায় করা যাবে না। বাসা-বাড়িতে ঈদের নামাজ আদায় করতে হলেও অবশ্যই জামাআতে ঈদের নামাজ আদায় করতে হবে।

ঈদের নামাজের পার্থক্য

তবে ঈদের নামাজের জন্য পার্থক্য হলো অতিরিক্ত ৬টি তাকবির দিতে হবে।

- প্রথম রাকাআতে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত বেঁধে অতিরিক্ত তিন তাকবির দিয়ে সুরা ফাতিহা পড়া।

-দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা মিলানোর পর অতিরিক্ত তিন তাকবির দিয়ে রুকতে যাওয়া।

ঈদের নামাজ

ঈদের নামাজের জন্য কোনো আজান ও ইকামত নেই। তবে জুমআর নামাজের মতোই উচ্চ আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়।

প্রথম রাকাত

১. তাকবিরে তাহরিমা

ঈদের নামাজে নিয়ত করে তাকবিরে তাহরিমা 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধা।

২. ছানা পড়া

'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়াতাআলা যাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

৩. অতিরক্তি ৩ তাকবির দেয়া।

এক তাকবির থেকে আরেক তাকবিরের মধ্যে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় বিরত থাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় তাকবিরে উভয় হাত উঠিয়ে তা ছেড়ে দেয়া এবং তৃতীয় তাকবির দিয়ে উভয় হাত বেধেঁ নেয়া।

৪. আউজুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়া

৫. সুরা ফাতেহা পড়া

৬. সুরা মিলানো। অতপর নিয়মিত নামাজের মতো রুকু ও সেজদার মাধ্যমে প্রথম রাকাআত শেষ করা।
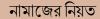
ঈদের দুই রাকাআত ওয়াজিব নামাজ অতিরিক্ত ৬ তাকবিরের সঙ্গে এই ইমামের পেছনে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর জন্য আদায় করছি... আল্লাহু আকবার।

দ্বিতীয় রাকাত

১. বিসমিল্লাহ পড়া

২. সুরা ফাতেহা পড়া

৩. সুরা মিলানো।

৪. সুরা মিলানোর পর অতিরিক্ত ৩ তাকবির দেয়া। প্রথম রাকাআতের মতো দুই তাকবিরে উভয় হাত কাধ বরাবর উঠিয়ে ছেড়ে দেয়া অতপর তৃতীয় তাকবির দিয়ে হাত বাঁধা।

৫. তারপর রুকুর তাকবির দিয়ে রুকুতে যাওয়া।

৬. সেজদা আদায় করে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামাজ সম্পন্ন করা।

তারপর খুতবা........

ঈদের নামাজ পড়ার পর ইমাম খুতবা দেবে আর মুসল্লিরা খুতবা মনোযোগের সঙ্গে শুনবে। অতিরিক্ত তাকবিরের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাজহাবসহ অনেকেই প্রথম রাকাআতে তাকবিরে তাহরিমাসহ ৭ তাকবির আর দ্বিতীয় রাকাআতে ৫ তাকবিরে দিয়ে থাকেন।

আর ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য ইমাম ছাড়া ন্যূনতম তিনজন মুসল্লি হতে হবে। পরিবার নিয়ে জামাআতে ঈদের নামাজসহ যে কোনো ওয়াক্তের নামাজে দাঁড়ানো যাবে, তবে ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

জানাযার

স্বলাতের

বিধান

জানাজার নামাজ পড়ার নিয়ম-বিধান

জানাজার নামাজ মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও মাগফিরাত। একাধিক মৃতের জানাজা একসঙ্গে পড়া যায়। মহল্লার ইমাম জানাজা পড়ানোর ক্ষেত্রে বেশি হকদার। এরপর মৃতের ওলি বা আত্মীয়-স্বজন। তবে ওলি-আত্মীয় ইমামের চেয়ে বেশি দ্বীনদার হলে তার-ই বেশি হক। কাউকে জানাজা পড়ানোর জন্য মৃত অসিয়ত করে গেলে, তা কার্যকর করা জরুরি নয়। একান্ত প্রয়োজনে পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারীরাও জানাজা পড়াতে পারবেন। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ১/২২২, আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/২৩৮)

লাশের প্রকারভেদে করণীয়

মৃতের প্রকারভেদে শরিয়তে বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। মাথাহীন লাশের বেশির ভাগ পাওয়া গেলে বা মাথাসহ অর্ধেক শরীর পাওয়া গেলে তার গোসল, কাফন ও জানাজা সবই করতে হয়। আর মাথাহীন অর্ধেক বা তার চেয়ে কম অংশ পাওয়া গেলে এসব করতে হয় না। বরং কোনো কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হয়। আর মৃত নাস্তিক-মুরতাদের গোসল-জানাজা ছাড়াই গর্ত করে কবরস্থ করতে হয়। (ফাতাওয়া শামি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯২)

কোনো নারী যদি সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন, তাহলে তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হবে না। তবে দুশ্চরিত্র ও বখাটের হাতে নিহত নারী শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। কেউ আত্মহত্যা করলে সাধারণ মুসলমানের নিয়মে তারও গোসল, কাফন-জানাজা ও দাফন করতে হয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৭২)

জানাজার ফরজ-সুন্নত

জানাজার নামাজের ফরজ দুইটি।

এক. চারবার 'আল্লাহু আকবার' বলা।

দুই. দাঁড়ানো। জানাজা সহিহ হওয়ার জন্য লাশ উপস্থিত থাকা শর্ত।

জানাজার সুন্নত তিনটি।

এক. আল্লাহর হামদ ও সানা পড়া।

দুই. নবীজি (সা.)-এর ওপর দরুদ পড়া।

তিন. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

(ইলাউস সুনান : ৮/১৭৪)

জানাজার নামাজ পড়ার নিয়ম

জানাযা নামাজ পড়ার পদ্ধতি হলো- জানাজার নামাজ আদায়ের আগে মৃতকে কিবলার দিকে জমিনে রাখতে হবে। ইমাম তার বক্ষ বরাবর দাঁড়াবেন। এরপর জানাজার নিয়ত করতে হবে। নিয়ত মনে মনে করলেই যথেষ্ট। মুখে আলাদা করে উচ্চারণ করতে হয় না; তবে কেউ করলে অসুবিধা নেই।

নিয়ত এভাবে করা যায়- 'আমি জানাজার ফরজে কিফায়া নামাজ চার তাকবিরের সঙ্গে কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।'

তাকবির বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত ওঠাতে হয়। এরপর নাভির নিচে হাত বেঁধে সানা (নামাজের) পড়তে হয়। তবে সানার মধ্যে 'ওয়া তাআলা জাদ্দুকা'-এর পর 'ওয়া জাল্লা সানাউকা'ও পড়তে হয়। এরপর তাকবির বলে দরুদে ইবরাহিম পড়তে হয়। তারপর তাকবির বলে নির্দিষ্ট দোয়া পড়তে হয়। চতুর্থ তাকবির বলে ডানে-বাঁয়ে সালাম ফেরাতে হয়।

বি:দ্র: জানাযার নামাজের জন্য ন্যুনতম তিন কাতার করাও অনেক আলেমের নিকট সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত। বেশি কাতার করতে কোনো বাঁধা নেই। তবে কাতার বেজোড় করা উত্তম।

লক্ষণীয় যে, কেউ যদি ইমাম চতুর্থ তাকবির বলার পর সালাম ফেরানোর আগ মুহূর্তেও তাকবির বলতে পারেন, তাহলে সে জানাজা পেয়েছে বলে গণ্য হবে। আর কেউ দেরি করে ফেললে তখন লাশ উঠিয়ে নেওয়ার আগে সানা, দরুদ ও দোয়াসহ তাকবির বলে সালাম ফেরাতে পারলে, তা-ই করে নিতে হবে। যদি লাশ উঠিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে শুধু তিন তাকবির বলে সালাম ফিরিয়ে নেবে। (রদ্দুল মুহতার : ৩/১১৬)

প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের জানাজার দোয়াঃ

لَّهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَاوَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَا نَا
اَللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى
الاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى
الْاِيمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

তবে নাবালক ছেলের ক্ষেত্রে জানাজার দোয়া পড়তে হবে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وْاَجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

নাবালিকা মেয়ের ক্ষেত্রে জানাজার দোয়া পড়তে হবে

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًاوَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

দরূদ ইবরাহিম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

সূরা ফালাক্ব

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ۝

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلۡعُقَدِ ۝

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝
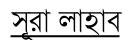
تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

وَامْرَأَتُهُۥ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

মুসাফিরের স্বলাতের বিধান

মুসাফিরের পরিচয়

যে ব্যক্তি ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য ৪৮ মাইল তথা প্রায় ৭৮ কিমি সফর করার নিয়তে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির বলে এবং এই যাত্রাকে সফর বলে।

ইসলামি শরীয়তে মুসাফিরের জন্য কিছু বিধানে শিথিলতা আছে। নামাজে কসর করা, রোজা না রাখার ইচ্ছাধিকার, জুমা ও দুই ঈদের নামাজের ব্যাপারে স্বাধীনতা, কোরবানি না করা ইত্যাদি।

ক্বসরের হুকুম

ক্বসর অর্থ সংকোচন করা বা কমানো।

শরীয়তের ভাষায় ক্বসর হলো মুসাফির ব্যক্তির ৪ রাকাতবিশিষ্ট ফরজ স্বলাত ২ রাকাত পড়া। যা মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব। মুসাফির হয়েও যদি ক্বসর না করে তাহলে গুনাহগার হবে।

তবে তিন রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ, ওয়াজিব নামাজ এমনকি সুন্নাত নামাজ পূর্ণ আদায় করতে হবে।

সফর সহিহ হওয়ার শর্তাবলী:

১. সফরের নিয়তকারী প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। নাবালেগ শিশুর নিয়ত দ্বারা সফর শুদ্ধ হবে না।

২. সফরের নিয়তকারী স্বনির্ভর হওয়া অর্থাৎ কারো অনুগামী না হওয়া।
সুতরাং স্বামীর সফরের নিয়ত ছাড়া স্ত্রীর সফরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে তিনদিন লাগে এই পরিমাণ দূরত্ব হওয়া। এর কম দূরত্ব দ্বারা সফর হবে না।

প্রাসংগিক মাসায়েল:

১. মুসাফির ব্যক্তি সফরের নিয়তে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হওয়ার পর থেকেই ক্বসর শুরু করবে। এবং পুনরায় সফর থেকে ফিরে নিজ শহরে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত চালিয়ে যাবে।

২. সফর পরিমাণ দূরত্ব কেউ এক ঘন্টায় অতিক্রম করলে তাও সফরের বিধান কার্যকর হবে।

৩. যদি কোনো ব্যক্তি কোন এলাকায় ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়তে যাওয়ার পর নতুন কোনো প্রয়োজনে আরো বেশি সময় থাকতে হয় এভাবে যদি কয়েক বছর অতিক্রম করে তবুও সে ক্বসর আদায় করতে থাকবে।

৪. কোনো ব্যক্তি ১৫ দিনের বেশি সময় থাকার নিয়তে সফর সমান দূরত্ব অতিক্রম করলো। কিন্তু ১৫ দিনের আগেই ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। তিনি পূর্ণ স্বলাতই আদায় করবেন।

৫. মুসাফির ব্যক্তির চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ যদি ছুটে যায় এবং তা যদি ক্বাযা আদায় করতে চায় তাহলে ২ রাকাতই আদায় করবে তা সফরে হোক বা বাড়িতে হোক।

আর যদি মুকিম অবস্থায় কোনো ফরজ স্বলাত ছুটে যায় এবং তা যদি ক্বাযা আদায় করতে চায় তাহলে পূর্ণ নামাজই আদায় করতে হবে তা সফরে হোক বা বাড়িতে হোক।

৬. গন্তব্যস্থান নিজের বাড়ি হলে ক্বসর হবে না, তা যে কদিনই থাকার নিয়ত হোক।

৭. মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পিছনে স্বলাত আদায় করলে পূর্ণ ৪ রাকাতই আদায় করবে।

৮. গন্তব্যস্থানে ১৫ দিনের বেশি থাকার নিয়ত আছে কিন্তু সফরের দূরত্ব ৪৮ মেইল বা ৭৮ কি.মি এর বেশি। তাহলে সফর চলাকালীন পথিমধ্যে স্বলাত ক্বসর করবে কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে আর ক্বসর করবে না। পূর্ণ স্বলাত আদায় করবে।

সূরা নাস

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ